বিদআতি ও বিরোধীদের সাথে আচরণনীতি

শাইখ খালিদ বাতারফি হাফিযাহুল্লাহ

অষ্টম দরস

বিদআতি ও বিরোধীদের সাথে আচরণনীতি

শাইখ খালিদ বাতারফি হাফিযাহুল্লাহ

অষ্টম দরস

অনুবাদ ও প্রকাশনা

AL HIKMAH MEDIA

-মূল প্রকাশনা সম্পর্কিত কিছু তথ্য-

মূল নাম:

أصول التعامل مع أهل البدع والمخالفين – الدرس الثامن، للشيخ الأمير خالد باطرفي – حفظه الله –

ভিডিও দৈর্ঘ্য: ১১:০৯ মিনিট

প্রকাশের তারিখ: রজব ১৪৪২ হিজরি

প্রকাশক: আল মালাহিম মিডিয়া

নবম মূলনীতি: বিদআত প্রত্যাখ্যান, সুন্নাহর প্রতি আহবান এবং তুলনামূলক গুরুত্বপূর্ণ কাজকে প্রাধান্য দেয়ার ক্ষেত্রে আমর বিল মারুফ ও নাহী আনিল মুনকারের শর্তসমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখা।

পূর্বের অধ্যায়ে আমরা এই মূলনীতির সাথে সম্পর্কিত কিছু আলোচনা করেছিলাম। যেমন, কোন এক লোক আপনার গান গাওয়া বা শোনাকে অনেক অপছন্দ করে, অথচ সে সংগীতের চেয়েও নিকৃষ্ট কাজ অবলীলায় সমর্থন করে। উদাহরণস্বরূপ; আমরা বলতে পারি যে, তিনি হয়তো গণতন্ত্র পরিত্যাগ করা এবং জনসম্মুখে এই জঘন্য কুফরের বাস্তবতা তুলে ধরতে পছন্দ করেন না। অথচ গণতন্ত্র - সরাসরি ইসলাম ধর্মের বিপরীত একটি ধর্ম।

অনেক সময় দেখা যায়, আমরা সাধারণ জনগণের ছোট ছোট অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি নিয়ে আলোচনায় লিপ্ত হই। বিপরীতে অনেক বড় বড় ব্যক্তির গণতন্ত্রের মতো কর্মকাণ্ডের বিষয়ে চুপ থাকি। অথচ জরুরী হচ্ছে - বুনিয়াদি সমস্যা নিয়ে আলোচনা আগে তোলা। যেমন, সংসদে অংশ্রগহণ করার মত জাতীয় কার্যকলাপসমূহ।

কিছু মানুষকে এমন পাবেন, যখন তাদেরকে বলবেন "গণতন্ত্র কুফর"; তখন সে আশ্চর্যবোধ করবে এবং নানা কথা শুনিয়ে দেবে। তারা তর্ক করে বলবে, "তাহলে কী অমুক কাফের! তমুক কাফের"?

তখন আপনি তাকে বলুন যে, 'আপনি শিখবেন নাকি তর্ক করবেন? যদি শিখতে চান তাহলে বলুন যে, আমি এই বিষয়টি সম্পর্কে জানিনা, তবে জানতে চাই'। অত:পর আপনি তাকে বলুন, "আমি বলিনি যে ওমুক বা ওমুক কাফের। আমি বরং বলছি যে, এই মতবাদটি কুফর"।

আবার কিছু কিছু লোক আমাদের সম্পর্কে বলে যে, ওরা তো মন্দকর্মকে হালকা মনে করে। তখন আমরা প্রতিউত্তরে উদাহরণ স্বরূপ বলবো - এটি এমন এক বিষয়, যা ব্যক্তি বিশেষে হুকুম ভিন্ন হয়। অর্থাৎ গণতন্ত্রকে অনুধাবন ও অন্তরের বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সবার অবস্থান এক রকম নয়। সুতরাং ফায়সালা করতে হবে বাস্তবতার আলোকে। আর বাস্তবতার আলোকে ফায়সালা করাই কি মন্দকে

হালকা মনে করার নামান্তর? বিপরীতে প্রচলিত ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর সংসদের উচ্চ ও নিম্নকক্ষে অংশ গ্রহণের বিরোধিতা না করা কি মন্দকে হালকা করার নামান্তর নয়?

"কোন মন্দকে মন্দ দ্বারা পরিবর্তন করার প্রচেষ্টা কেবল মন্দকেই বৃদ্ধি করে"

ইতিপূর্বে; ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী, সমাজতন্ত্রী, ডান ও বামপন্থীদের সমালোচনা করা হতো। বাস্তবে এরা সকলেই অপরাধী। কিন্তু ইসলামপন্থীরা সংসদে অংশগ্রহণের পর চিত্র পরিবর্তন হয়ে গেলো। যা কিছুদিন আগেও অন্যায় ও অবৈধ ছিল, তাই এখন বৈধতা পেতে লাগলো!

এর কারণ হল কিছু মুফতি এবং দা'য়ীদের ফতওয়া। অত:পর যখন কেউ দায়ী ও মুফতিগণকে এসব কাজে অংশ নিতে দেখে তখন তার কাছে বিষয়টি বৈধতা পেয়ে যায়। এটি একটি মারাত্মক সমস্যা। সুতরাং আমাদের উচিত সর্বদা এমন গর্হিত কাজ থেকে বিরত থাকা।

আবার মতবিরোধের বিষয়ে আসি। আমরা মানুষের সাথে ইখতিলাফ করবো। এক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই তুলনামূলক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে প্রাধান্য দিবো। অর্থাৎ প্রথমে আমরা আকিদা সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দিব। অত:পর কর্মপন্থা এবং সবশেষে আখলাক সংশ্লিষ্ট বিষয়কে প্রাধান্য দিব।

উক্ত মূলনীতি (আমর বিল মারুফ ও নাহী আনিল মুনকারের শর্তসমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখা) বিষয়ে ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ রহিমাহুল্লাহ বলেন:

"রাসূলের কোন সুন্নাহর প্রতি আদেশ করা এবং বিদআত থেকে নিষেধ করার নামই হলো - আমর বিল মা'রুফ ও নাহী আনিল মুনকার। আর এটাই হলো সর্বোত্তম নেক আমল। তবে এজন্য জরুরী হলো পূর্ণ ইখলাস ও শরীয়াহর পূর্ণ অনুসরণ"।

হাদীস শরীফে এসেছে;

لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فقيها فيما يأمر به ، فقيها فيما ينهى عنه ، رفيقا فيما يأمر به ، رفيقا فيما ينهى عنه ، حليما فيما يأمر به ، حليما فيما ينهى عنه .(مجموع الفتاوى 137/28

“যে ব্যক্তি সৎকাজের আদেশ করবেন এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবেন তিনি উক্ত বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞানী হবেন, কোমল আচরণকারী হবেন এবং সহনশীল হবেন” । (মাজমুউল ফাতওয়া-২৮/১৩৭)

--

তবে এক্ষেত্রে নিম্নের ধারাবাহিকতা লক্ষ্য রাখতে হবে; দাওয়াতের পূর্বে প্রয়োজন হবে ইলম অর্জনের। আর দাওয়াতের সময় কোমলতা আর দাওয়াতের পর সহনশীলতা থাকতে হবে।

কেননা তিনি যদি আলোচ্য বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান না রাখেন তবে সে বিষয়ে কথা না বলাই মঙ্গলজনক। যদি তিনি আলেম হন, কিন্তু আচরণে কোমল না হন তখন তার দৃষ্টান্ত ঐ ডাক্তারের মত হবে যার মাঝে কোমলতা বলতে কিছুই নেই। বরং রোগীর সাথে রুঢ় আচরণ করে, যার ফলে রুগী তার পরামর্শ গ্রহণ করে না। এই দায়ী ঐ শিষ্টাচার শিক্ষাদানকারী রুঢ় শিক্ষকের ন্যায় যার থেকে বাচ্চারা শিক্ষা গ্রহণ করে না।

আল্লাহ তা’য়ালা মুসা ও হারুন আলাইহিস সালামকে নির্দেশ দিয়েছেন

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ

“অর্থঃ তোমরা তার সাথে নরম কথা বলো; হতে পারে সে উপদেশ গ্রহণ করবে কিংবা আল্লাহকে ভয় করবে”। (সূরা ত্বহা ২০:৪৪)[১]

দা’য়ীকে সাধারণত কিছু কষ্টকর আচরণের সম্মুখীন হতে হয়। তখন কর্তব্য হল ‘ধৈর্যধারণ করা’ এবং ‘সহনশীল হওয়া’। যেভাবে আল্লাহ তা’য়ালা বলেছেন;

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

[১] এই আয়াতটি হলো ফিরআউনের সাথে মুসা আলাইহিস সালামের দাওয়াতের ক্ষেত্রে আচরণবিধি। সুতরাং একজন কাফিরের ক্ষেত্রে যদি এমনটি হয় তাহলে ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে কেমন আচরণ করতে হবে, যার সাথে মৌলিকভাবে ইসলামের সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু সে জানেনা যে কোন বিষয়টি কুফর এবং কোন বিষয়টি নাজায়েজ?

“অর্থঃ হে বৎস, নামায কায়েম কর, সৎকাজে আদেশ দাও, মন্দকাজে নিষেধ কর এবং বিপদাপদে সবর কর। নিশ্চয় এটা সাহসিকতার কাজ। (সূরা লুকমান ৩১:১৭)

সকল দায়ী - তথা আমর বিল মারুফ ও নাহী আনিল মুনকারের দিকে আহবানকারীদের ইমাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ মুশরিকদের কষ্টদানের উপর একাধিক স্থানে সবরের আদেশ করেছেন।

সুতরাং দা’য়ী ভাইয়ের জন্য আবশ্যক হলো - তিনি সর্বপ্রথম লক্ষ্য রাখবেন - তার আদেশ করাটা যেন একমাত্র আল্লাহর জন্য হয়। আদিষ্ট বিষয়ে একমাত্র লক্ষ্য থাকবে আল্লাহর আনুগত্য করা। তার উদ্দেশ্য থাকবে মাদউ এর সংশোধন এবং যথাযথ দলিল উপস্থাপন করা।

কিছু মানুষের স্বভাব হলো; যথাযথ দলিল উপস্থাপন না করেই সংশোধনের কাজ শুরু করে। এ ধরনের ব্যক্তিদের মাঝে সাধারণ হুজ্জাত কায়েমের উদ্দেশ্য থাকে, ব্যক্তির সংশোধন নয়। তো যখন নিয়তের মধ্যে এ ধরণের উদ্দেশ্য থাকবে, তখন মা’মুরের সাথে তার আচরণ ভিন্ন হয়। কারণ, তখন তো শুধু প্রমাণ উপস্থাপন করেই তার সাথে কথা শেষ হয়ে যাবে এবং বিষয়টি এখানে স্থগিত হয়ে যাবে। দা’য়ী এ কথা বলতে বলতে বের হয়ে যাবে যে, আমি অমুক অমুকের ব্যাপারে হুজ্জাত কায়েম করে ফেলেছি যে অমুক কাফের, অমুক ফাসেক বা অমুক বিদআতি !!!

কিন্তু যদি তার উদ্দেশ্য থাকে মা’মুরকে সংশোধন করা - তখন বিষয়টি শেষ হওয়া পর্যন্ত এক, দুই, তিন এভাবে বহু বৈঠকে তিনি সবরের সাথে দাওয়াত দিয়ে যাবেন এবং শুরুতেই এভাবে বলবে না।

মোট কথা - কোন কাজ বা কাউকে সংশোধন করার ক্ষেত্রে ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। বরং কিছু লোক এমন রয়েছে, তারা যখন আপনাকে দেখবে যে, আপনি তার প্রতি আগ্রহী - তখন তারা আপনাকে কোনভাবেই অনুসরণ করবে না এবং আপনার কথাও শুনবে না। শুধু এই কারণেই যে, আপনি যা বলছেন তা সত্য। কখনও এ কারণেও যে, সে তার প্রতি আপনার আগ্রহ বুঝতে পেরেছে।

সুতরাং উদ্দেশ্য ঠিক করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নিয়তকে আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ করা ও সংশোধন করা জরুরী। বিদআতি অথবা অন্যায়কারীকে সংশোধন করার ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ নিয়তের বিরাট ভূমিকা রয়েছে।

ইবনে তাইমিয়াহ রহিমাহুল্লাহ বলেন:

"যদি কোন ব্যক্তি নিজের এবং নিজ দলের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এবং অন্যকে ছোট করার উদ্দেশ্যে এমনটি করে থাকে তাহলে তা হবে নিতান্তই গোঁড়ামী; যা আল্লাহ তায়ালা কখনোই কবুল করবেন না। তদ্রূপ কেউ যদি সুনাম সুখ্যাতি অর্জন ও অহমিকা বসত: এমনটি করে থাকে তাহলে তার কাজটিও বিফলে যাবে"। (মিনহাজুস সুন্নাহ)

তিনি আরও বলেছেন –

"যখন কোন দা'য়ী কোন বিদআত বা গুনাহের তীব্র নিন্দা করবে, তখন তার একমাত্র উদ্দেশ্য থাকবে - বান্দাদেরকে সতর্ক করার জন্য গুনাহের খারাবিসমূহ বর্ণনা করা, যাতে মানুষ তা বর্জন করতে পারে। যেমনটি ওয়ায়ীদ (ভীতি প্রদর্শন) সম্বলিত আয়াত ও হাদিসে পরিলক্ষিত হয়।

আবার কখনো কখনো ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করা হয় শাস্তি স্বরূপ। এর উদ্দেশ্য হলো - তাকে ও তার মত অন্যান্য ব্যক্তিদেরকে সতর্ক বার্তা দেয়া। তবে তা হবে তার প্রতি সদাচরণ ও হিতকামনার জন্য, প্রতিশোধের জন্য নয়। যেভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবুক যুদ্ধে উপস্থিত না হওয়া তিন সাহাবিকে পরিত্যাগ করেছিলেন, যারা মুনাফিকদের মতো আল্লাহর নামে মিথ্যা কসম করে ওযর পেশ করেনি। তাদের শাস্তি দেয়া হয়েছে পরিত্যাগের মাধ্যমে। অত:পর আল্লাহ তায়ালা তাদের সত্যবাদিতার বরকতে তাদের তাওবা কবুল করেছেন।

এর ভিত্তি হলো দুটি বিষয়ের উপর -

১. কবিরা গুনাহের কারণে কোন ব্যক্তি কাফির হয়ে যায় না। যেমনটি খারেজীরা বলে থাকে। এই গুনাহ তার জন্য জাহান্নামকে চিরস্থায়ী হওয়ার এবং সুপারিশ প্রাপ্ত না হওয়াকে আবশ্যক করবে না। যেমনটি মু'তাযিলারা বলে থাকে।

২. দ্বিতীয় বিষয় হলো, যে তা'বীলকারীর উদ্দেশ্য থাকবে রাসূলের অনুসরণ করা, তাকে কাফের বলা যাবে না। আর যদি সে ইজতিহাদ করে ভুল করে তখন তাকে

ফাসেকও বলা হবে না। আমল সম্পর্কিত মাসআলায় এই মতটাই প্রসিদ্ধ। পক্ষান্তরে আকীদাগত মাসআলায়ও ভুলকারীদেরকে অনেকে কাফের বলে আখ্যায়িত করেন। অথচ সাহাবা, তাবেঈনদের কারো থেকে এ ধরণের কোন বক্তব্য জানা তো দূরের কথা - এমনটি মাযহাবের কোন ইমামদের থেকেও জানা যায়নি।

এটি মৌলিকভাবে বিদআতিদের বক্তব্য। যারা ইসলামে বিদআত আবিষ্কার করে, তারাই বিরোধীদের কাফের বলে বেড়ায়। যেমন, খারেজী, মু'তাজিলা ও জাহমিয়্যাহ"। (মিনহাজুস্ সুন্নাহ)

শাইখুল ইসলাম রহিমাহুল্লাহ অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে তুলনামূলক কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর প্রাধান্য দেয়ার ক্ষেত্রে বলেছেন:

"কিছু মানুষ মিলাদুন নবীকে সম্মান প্রদর্শন করে এবং তাকে নিয়ে উৎসব উদযাপন করে। কখনো কখনো মানুষ এটি করে থাকে, রাসূলের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও সদিচ্ছা থাকার কারণে সে বিরাট সাওয়াবের অধিকারী হবে বলে আশা করে। পূর্বে আমি উল্লেখ করেছি যে, সাধারণ মানুষের জন্য বৈধ কাজটি খাঁটি মুমিনের জন্য তাকওয়ার পরিপন্থী বিবেচনা করা হয়।

এ কারণে একবার ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহিমাহুল্লাহকে কিছু আমির সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, তারা এক একটা মুসহাফের জন্য এক হাজার দিনার খরচ করে!!? তখন তিনি বললেন: 'আরে রাখ!, তারা সাধারণত অহেতুক কাজে যে হাজার হাজার দিনার ব্যয় করে তার চেয়ে এটি উত্তম'।

অথচ স্বয়ং আহমাদ রহিমাহুল্লাহ এর মাযহাব মতে - মুসহাফকে কারুকার্য করা মাকরূহ। যদিও আহমাদ রহিমাহুল্লাহ এর কোন কোন ছাত্র তার ব্যাখ্যা এইভাবে করেছেন যে, তারা মুসহাফের পাতা ও হস্তলিপির মান উন্নত করতে গিয়ে এক হাজার দিনার খরচ করেছেন। অথচ ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহর উদ্দেশ্য এটি নয়। বরং তার উদ্দেশ্য হলো, এই কাজে যেমন রয়েছে কল্যাণের দিক তেমনি তাতে রয়েছে ক্ষতির দিকও। যার কারণে তিনি কুরআনকে সুসজ্জিত করাকে মাকরূহ বলেছেন।

এসব শাসকেরা যদি মুসহাফ কারুকার্যের পিছনে বড় অংকের টাকা খরচ না করতো তাহলে তার বিপরীতে অনর্থক ও বেহুদা অন্য অনেক কাজে তা ব্যয় করতো। যেমন, তারা হয়তো ঐ সম্পদ কিচ্ছা-কাহিনী, কবিতা কিংবা রোম পারস্যের দর্শন বা এজাতীয় গ্রন্থের পিছনে অপচয় করতো"।

অর্থাৎ এই বিবরণের মাধ্যমে আপনি ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ এর ফাকাহাতের প্রতি লক্ষ্য করুন। কুরআন শরীফের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য এক হাজার দীনার খরচ করা একটি ভুল কাজ। কিন্তু কিচ্ছা-কাহিনী, দর্শন, রোম পারস্যের হেকমতের কিতাবের পিছনে খরচ করা থেকে কম খারাপ।

কিন্তু কুরআন শরীফ সৌন্দর্য বৃদ্ধির এই কাজ যদি এই আমীর ছাড়া অন্য কেউ করত তাহলে তাকে নিষেধ করা হত। কারণ, তার ক্ষেত্রে এটি প্রথম প্রত্যাখ্যানযোগ্য কাজ। কিন্তু আমিরের ক্ষেত্রে হুকুম ভিন্ন।

ইমাম ইবনুল কায়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহ শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ এর একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। একবার শাইখুল ইসলাম রহিমাহুল্লাহ তার সঙ্গীদের নিয়ে সফর করছিলেন। পথিমধ্যে তারা দেখতে পেলেন কিছু তাতারী মদ পান করে মাতাল হয়ে আছে।

একজন তাদের এই কাজে বাঁধা দিতে চাইলো। ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ তাকে বললেন, "না, তাদেরকে কিছু বল না। কারণ তারা যতক্ষণ মদ পান করে মাতাল হয়ে থাকে ততক্ষণ তারা মুসলমানদের ক্ষতি থেকে বিরত থাকে"।

ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন, "দ্বীনের বাস্তবতাকে অনুধাবন করুন। শরয়ী লাভ-ক্ষতি বিবেচনা করুন। ভালো কাজ ও মন্দ কাজের স্তর নির্ণয় করুন, যাতে আগের কাজ আগে করতে পারেন। কারণ, এই বাস্তবতা শিখাতেই নবীরা আগমন করেছেন। ভালো ও খারাপ কাজের স্তর নির্ণয় এবং কোনটা দলিল আর কোনটা দলিল নয় তা নির্ণয় করা শিখতে হবে"।(ইকতিযাউস সিরাতিল মুস্তাকিম)

বস্তত, খারাপ কাজের অনেক স্তর আছে। বিদআতের অনেক স্তর আছে। কোনটা বড় কোনটা ছোট – এটা বুঝতে হবে। আমাদের সংশোধন শুরু করতে হবে বড় থেকে ছোটর দিকে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুআজ বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে যখন ইয়ামানে পাঠালেন তখন তিনি বললেন, "মুআজ! তুমি আহলে কিতাব এক জাতীর কাছে যাচ্ছ। প্রথমে তাদেরকে কালেমার দিকে দাওয়াত দিবে। যদি তারা তোমার আহবানে সাড়া দেয় তাহলে তাদেরকে জানাবে যে, আল্লাহ তাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছেন"।

শরীয়ত বাস্তবায়ন ও খারাপ কাজে বাঁধা দানের ক্ষেত্রে ধীর গতি অবলম্বন করা। এবিষয়টি অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এখানে তার আলোচনার সুযোগ নেই। তবে শাইখ আবুল হাসান বুলাইদি রহিমাহুল্লাহ এর লিখিত "ফিকহু তাতবীকিশ শরীআহ" কিতাবের যেই পর্যালোচনা শাইখ আবু কাতাদা লিখেছেন সেটা খুব উপকারী। বিস্তারিত জানতে সেখানে দেখা যেতে পারে। এই কিতাবের মধ্যে আরও একটি উপকারী বিষয় আছে, তা হলো, বর্তমানের অনেক ঘটনার পর্যালোচনা এবং এ বিষয়ে অনেকের মতামত। কেউ ধীরগতি অবলম্বনকে অস্বীকার করেছেন, আবার কেউ বলেছেন এটা তো শরীয়তকে না করার শামিল। আবার কেউ কেউ মধ্যমপন্থা অবলম্বন করেছেন।

আল্লাহ আমাদেরকে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করার তাওফিক দান করুন, আমীন।